

## বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আন্দোলন ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

মাহমুদুল হক ফয়েজ

একটি শিশু জন্মের পর পরই প্রাকৃতিক ও সামাজিক ভাবে তথ্যবলয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। ক্ষিধে পেলে সে চিৎকার করে কেঁদে উঠে। হাত পা ছুঁড়ে। সে এ তথ্য জেনেই পৃথিবীতে এসেছে যে, ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এবং তা পেতে হলে তাকে এ পথ অবলম্বন করতে হবে। সে জানে এ আচরণ করলে কেউ না কেউ তার জন্য খাওয়া নিয়ে হাজির হবে। খাওয়ার জন্য এই যে সে কাঁদলো, খাওয়া পেতে হলে কাঁদতে হয়, এই তথ্য সে কি ভাবে জানলো? খাওয়া পেতে তো সে খলখলিয়ে হেসে উঠেছেনা। কিংবা চুপ করে ঘুমিয়েও পড়ছেনা। অধিকার পাওয়ার জন্য তার এই ভাষার প্রয়োগ সে আমৃত্যু ব্যবহার করে। বিজ্ঞানীরা এখন হিমসিম খাচ্ছেন জন্মের সাথে সাথে শিশু এই তথ্য কিভাবে রপ্ত করলো। এ তথ্য যদি তার জানা না থাকতো তাহলে তার কী পরিনতি হতো? সে অন্য আর কী আচরণ করতো? একটি মানুষকে সারা জীবন তথ্যের উপর নির্ভর করে চলতে হয়। তথ্যের অপূর্ণতা মানে জীবনেরও অপূর্ণতা। জন্মগত ভাবেই মানুষ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার লাভ করে। জীবন যাপনের জন্য তথ্যের প্রয়োজন কেন হবে? কারণ তথ্য বিহীন মানুষ নিশ্চল পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। তথ্যহীনতা মানে প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যওয়া।

আমরা একটি তথ্য বহুল সমাজে বাস করছি। অন্য ভাবে বলা যায় তথ্য জালের মধ্যে আমরা বিচরণ করছি। একটি সুস্থ্যমূল্যবোধ সম্পন্ন গণতান্ত্রিক সমাজ রাষ্ট্র বিনির্মানের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। প্রতিটি দেশেই গণতন্ত্র তার নিজস্ব পথ ধরে চলতে থাকে। যারা দেশ চালান এবং সে দেশের জনগণকে সে গণতন্ত্রের চাকা সচল ও নির্ভুল রাখতে সদা সজাগ অবস্থায় থাকতে হয়। জহরলাল নেহেরু এ সজাগ থাকাকে বলেছিলেন ‘ইটারনাল ভিজিলেন্স’। চলমান চাকা তখনই বিচ্যুতি ঘটে যখন জনগণের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দেশও তখন নানান দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। দেশ ও দেশের জনগণ পড়ে মহা সঙ্কটে। এই সঙ্কট পরিহারের জন্য দেশের কয়টি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন ও সক্রিয় থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। এর মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন, বিচার ব্যবস্থা, একটি সচল সংসদ, প্রশাসনের সচ্ছতা ও জবাব দিহিতা এবং সর্বপরি জনগণের তথ্য জানার অধিকার। দেশের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠান গুলো সদা জাগ্রত ও সক্রিয় থাকলে দেশে গণতন্ত্র নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নির্ঝঞ্জাট অবস্থায় চলতে বাধ্য। দেশও ক্রমাগত একটি আধুনিক রাষ্ট্রের গৌরব পেতে থাকে।

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের জনগণ তথ্য প্রবাহের সঙ্কটে পড়তে থাকে। এ সঙ্কট থেকে আজও আমরা নিষ্কৃতি পাইনি। শাসক শ্রেণী বরাবরই জনগণকে সাবধান করে দেয় রাষ্ট্রের গোপন তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। প্রাচীন কালে রাষ্ট্রগুলো সার্বক্ষণিক যুদ্ধাবস্থায় থাকতো। সে সময় বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রক্ষীয় গোপনীয়তার

প্রয়োজন পড়তো। তখন রাষ্ট্র এ গোপনীয়তা কঠোর ভাবে পালন করতো। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর ক্রমোন্নতির ফলে দাপ্তরিক গোপনীয়তার ধারণাটিরও পরিবর্তন ঘটছে। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার সূত্র ধরে তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলো এটি আরো কঠিন ভাবে পালন করছে। ফলাফল স্বরূপ সে সব দেশগুলোতে এর ব্যাপক অপব্যবহার ও ভুল ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে সে সব দেশে রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের আধিক্যও বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু নির্যাতনের ক্ষেত্রেই নয় সীমাহীন দুর্নীতি সে সব দেশ গুলোকে লজ্জাজনক ভাবে গ্রাস করতে থাকে। বাংলাদেশ এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে এই বিষয়টি আরো লজ্জাজনক। অথচ সরকারগুলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অজুহাতে তথ্য তার গোপন এখতিয়ারে রাখা আধুনিক এ তথ্যপ্রযুক্তির যুগে একেবারে অচল। জনগনের সার্বিক অংশগ্রহন ছাড়া একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কল্পনা করা এযুগে অসম্ভব। তাই জনগনের মধ্যে অধিক হারে তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারলে গণতন্ত্রও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

আজ এ বিষয়টি সবার মধ্যে উপলব্ধিতে এসেছে যে সমাজের মধ্যে তথ্যের সমৃদ্ধতা যত বেশী থাকবে জাতীর উন্নয়নও ততবেশী হতে থাকবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, আইনের বিভিন্ন মারপ্যাঁচে তথ্যপ্রবাহের গতি ও বিস্তৃতিতে বিভিন্ন ভাবে রোধ করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানই সমালোচনার উর্ধ্বে থাকতে পারেনা। তাই সব প্রতিষ্ঠানের বৈসাদৃশ্যগুলো জনগনের অবগতির জন্য প্রকাশ করা উচিত। শুধু ত্রুটি-বিচ্যুতিই নয়, তাদের কাজের গতি প্রকৃতি ভালো-মন্দ প্রকাশ পেলে জনগনের মধ্যে আস্থার ভাব বিরাজ করবে। তা নাহলে, প্রতিষ্ঠান ভালোভাবে চলেও সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জন্ম হতে থাকবে। এ থেকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজগতা সৃষ্টি হতে পারে। সে কারনে আধুনিক রাষ্ট্র জনগনের তথ্য প্রাপ্তির সুযোগকে একটি অধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে বাংলাদেশে বিরাজমান আইনের ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

## ১.রাষ্ট্রদ্রোহ

## ২.গোপনীয়তা ভঙ্গ।

রাষ্ট্রদ্রোহ বলতে লিখিত বা কথিত শব্দাবলী,সংকেত বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির মাধ্যমেবা প্রকারান্তরে আইনবলে প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সৃষ্টির উদ্যোগকে বোঝানো হয়। এই ধরনের অপরাধের ব্যাখ্যা ও তার জন্যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে দণ্ডবিধি ১২৩ ক,১২৪ ক ধারায়। তাছাড়া দণ্ডবিধির ৫০৫ এবং ৫০৬ ক ধারা (যা ১৯৯১ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না

হলেও ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯ ক ও ৯৯ খ ধারা (যা ১৯৯১ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে জারি করা হয়েছে) এই ক্ষেত্রের আওতার মধ্যে বিবেচিত হতে পারে।

অফিসিয়াল সিক্রেস অ্যাক্ট-১৯২০ আইনটি একটি ঔপনিবেশিক আইন। ব্রিটিশরা ভারত শাসনের সময় তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে এই আইনটি এ দেশের জনগনের উপর চাপিয়ে দেয়। এটি এমন একটি আইন যেখানে সরকারি বা দাপ্তরিক গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইন একত্রিত করা হয়েছে। এতে গুপ্তচরবৃত্তি ও গোপন তথ্য আদান প্রদানের মতো অপরাধের বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আইনের ৩ নম্বর ধারায় কিছু কিছু কাজকে শাস্তি মূলক অপরাধ ঘোষণা করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই আইনের জুজুর ভয় দেখিয়ে মফস্বলের এমনকি গ্রামের তহশিল অফিসের নিম্ন পদস্থ কর্মচারীরাও জনগনকে কোনো প্রকার তথ্য দিতে গড়িমশি করে।

৩. নম্বর ধারায় গুপ্তচর বৃত্তির জন্য দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

(১) যদি কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে:-

(ক) কোনো নিষিদ্ধ এলাকায় গমন করে কিংবা পরিদর্শন করে কিংবা নিষিদ্ধ স্থানটির কাছে যায় বা প্রবেশ করে কিংবা

(খ) কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল বা বিবরণ তৈরী করে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রুর কাজে লাগানোর জন্য করা হয় বা কাজে লাগাতে পারে এই উদ্দেশ্যে করা হয়; কিংবা

(গ) কোনো গোপনসরকারী সংকেত গ্রহন, লিপিবদ্ধ, প্রকাশ কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে তা জ্ঞাত করে, কিংবা কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী বা তথ্য বা অন্য কোনো নথি বা তথ্য অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে সরবরাহ করে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কোনো শত্রুর কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়।

(২) এই ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান সম্বলিত কোনো অপরাধের বিচারে এটি দেখানো জরুরী নয় যে, অভিযুক্তব্যক্তি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ কাজ করার জন দোষী। তার বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনো কাজের অভিযোগ প্রমানিত না হলেও সে দণ্ডিত হতে পারে, যদি মোকদ্দমার অবস্থায় তার আচরণ বা তার জ্ঞাত পূর্বচরিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর ছিলো; এবং যদি কোনো নকশা প্ল্যান, মডেল সামগ্রী, তথ্য, দলিল কিংবা কোনো নিষিদ্ধ স্থানে ব্যবহৃত বা নিষিদ্ধ স্থান সংশ্লিষ্ট, কিংবা এ ধরনের কোনো কোনো স্থানের কোনো কিছু বিষয়ক তথ্য, কিংবা কোনো গোপন সরকারি সংকেত বা সংকেত শব্দ বৈধ কতৃপক্ষের অধীনে কর্মরত কোনো ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কাছে সরবরাহ করায়, কিংবা এই ধরনের কিছু গ্রহন, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ বা প্রকাশ করে, এবং মামলার অবস্থা,

তার আচরণ বা তার জ্ঞাত পূর্ব চরিত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর ছিলো তাহলে মনে করা হবে যে, এ ধরনের নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, টীকা, দলিল বা তথ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের প্রতি ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্যে গ্রহণ, সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ বা প্রকাশ করা হয়েছে কিংবা সরবরাহ করা হয়েছে।

এই আইনের ৫ ধারায় তথ্যের আদান প্রদান সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এতে বলা হয়েছে—

- (১) কোনো ব্যক্তির কাছে বা নিয়ন্ত্রনে যদি কোনো গোপন সরকারি বা দাপ্তরিক সংকেত বা সংকেত শব্দ কিংবা কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, নোট, নথি বা তথ্য থাকে, যেগুলি কোনো নিষিদ্ধ স্থান সম্পর্কিত বা এ ধরনের স্থানে ব্যবহৃত হয়, কিংবা এ ধরনের কোনো স্থানের কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত কিংবা যা এই আইন লঙ্ঘনকরে প্রস্তুত এবং গ্রহণ করা হয়েছে, কিংবা সরকারের অধীনে কর্মরত কোনো কর্মকর্তা গোপনে তাকে সে কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছেন, কিংবা সে নিজে সরকারের অধীনে পূর্বে বা বর্তমানে দায়িত্ব পালন সূত্রে এগুলো লাভ করেছেন বা এ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন কিংবা সরকারে পক্ষে সম্পাদিত চুক্তিতে আবদ্ধ কোনো ব্যক্তি হিসাবে, কিংবা পূর্বে বা বর্তমানে এমন কোনো ব্যক্তির অধীনে কর্মরত ব্যক্তি হিসাবে এগুলি প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যে বর্তমানে বা আগে এই ধরনের পদে বা চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত রয়েছেন বা ছিলো, সে যদি:
- (ক) স্বেচ্ছায় এই সংকেত বা সংকেত শব্দ কিংবা কোনো নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, নোট, নথি বা তথ্য অনুমোদিত ব্যক্তি, আদালত বা রাষ্ট্রের স্বার্থে যাকে তার জানানো কর্তব্য, এমন কোনো ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকে জানিয়ে দেয়; কিংবা
- (খ) তার কাছে রাখা তথ্য কোনো বিদেশী শক্তির স্বার্থের জন্য, কিংবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতি কর অন্য কোনো ভাবে ব্যবহার করে; কিংবা
- (গ) নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, নোট বা নথিপত্র তার নিজের কাছে বা নিয়ন্ত্রনে রাখে, যখন সেগুলো রাখার কোনো অধিকার তার থাকেনা, কিংবা সেগুলো রাখা তার দায়িত্বের পরিপন্থী, কিংবা সে যদি সেগুলো ফিরিয়ে দেয়ার বা হস্তান্তর করার ব্যাপারে বৈধ কতৃপক্ষের দেয়া সকল নির্দেশ পালন করতে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হয়; কিংবা
- (ঘ) উপযুক্ত সতর্কতা বা যত্ন নিতে ব্যর্থ হওয়ায় যদি উক্ত নকশা, প্ল্যান, মডেল, সামগ্রী, নোট, দলিল, গোপন সরকারি সংকেত বা শব্দ কিংবা তথ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়।

তাহলে সে এই ধারার অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে।

যাঁরা গণমাধ্যমে কাজ করেন তাঁদের বড় বাজে অভিজ্ঞতা আছে যে, অনেক সাধারণ তথ্য পেতেও কি পরিমান ঝঙ্কি ঝামেলা পোহাতে হয়।

অফিসিয়াল সিক্রেস অ্যাক্ট-১৯২৩ নমের এই আইনের দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতার সুযোগে, তথ্য প্রবাহের এই বাস্তব যুগেও অনেকেই তথ্য প্রাপ্তির বিপরিতে বিশাল বিশাল যুক্তি ও ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারেন। সে কারনে এ আইনটি সরকারের নানান স্বার্থসিদ্ধিতে বাজে ভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, দেশের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সরকারের গৃহীত প্রতিটি কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য জানা জনগনের সংবিধানিক অধিকার।

একজন সংবাদ কর্মী হিসাবে গ্রামে গঞ্জে কাজ করার অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, সরকারি আধা সরকারি দপ্তর গুলোতে তথ্যগোপনীয়তাকে জনগণ অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই নিষেধ থাকে। তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের বিষয়ও তাদের মধ্যে ব্যাপক অস্পষ্টতা রয়েছে। ঠিক এ সুযোগটিই কাজে লাগায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুষ দুর্নীতি অনেকটা স্বাভাবিক গা সওয়া হয়ে গেছে। একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মানের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা জোরে সোরেই উচ্চারিত হয়। এই দুর্নীতি রোধের জন্য তথ্যের স্বাধীন সচল প্রবাহ সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। এ কথা আজ জোর দিয়েই বলা যায়, তথ্যসমৃদ্ধ সমাজই দেশকে সঠিক পথে চালিয়ে নিতে সক্ষম।

সব ক্ষেত্রে সবসময় জনগণ তথ্য পায়না। এই তথ্যের জন্য জনগণকে গণমাধ্যমের শরণাপন্ন হতে হয়। তাই গণমাধ্যমকে হতে হয় পরম দায়িত্বশীল। সমাজ সংস্কারক রূপেও তাকে অবতীর্ণ হতে হয়। জনগণকে সঠিক তথ্য প্রদান করে গণমাধ্যম যে জনসেবা করে আসছে সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নির্বিঘ্নে এ কাজটি হয়ে উঠেনা। তাদের এ কাজটি করতে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। নানা কালাকানুন বিধিনিষেধের বেড়াজালে ফেলে গণমাধ্যমকে প্রায় কঠরোধ করা হয়। বাংলাদেশে এর অবস্থা খুব সুখকর নয়। শাসক শ্রেণী জনগণকে শোষণ ও অবদমিত রাখতে গণমাধ্যমকেই প্রথম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। সে অবস্থাতেও গণমাধ্যম তার সঠিক কাজ করে যেতে সচেষ্ট রয়েছে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কতৃক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা পত্র গৃহীত হয়। সে ঘোষণার ধারা-১৯ এ বলা হয়েছে, প্রত্যেকেরই মতামত পোষন করা ও প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া মতামত পোষন করা এবং যে কোনো সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে তথ্য ও মতামত চাওয়া, গ্রহণ করা ও জানাবার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

দুঃখ জনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের গণমাধ্যম এখনো পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে খুব স্পষ্ট ভাবে বলা আছে—

১. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইলো।
২. রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা মানহানী বা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে -

ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং

খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম বিষয়ক সংগঠন, আইনজ্ঞ, সুধীজন, সুশীল সমাজ দীর্ঘদিন ধরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা বলে আসছে। অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট-১৯২৩ একটি কালো আইন হিসাবে পরিগণিত। এটি জনগনের তথ্য জানার অধিকারকে খর্ব করে। অবাধ তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতি নিয়তই সমাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষও ধীরে ধীরে অধিকার সচেতন হয়ে উঠছে। তাই আজ গণমাধ্যম সহ সর্ব মহলের দাবী, যত দ্রুত সম্ভব এই কালো আইন সহ সকল ক্ষতিকর আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এর সাথে সাথে মুক্তচিন্তার পথকে রুদ্ধ না করে একে উন্মুক্ত করে দেয়া শাসক শ্রেণীর জন্য হবে একটি পবিত্র কাজ।

**মাহমুদুল হক ফয়েজ**  
ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, নোয়াখালী  
উ-সদরঃ :- সযভডুরু@মসদরষ.পড়স  
সড়নঃ ০১৭১১২২৩৩৯৯

৭.৭.২০০৭

তথ্যসূত্রঃ

- সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের জন্য; সংকলনঃ জান্নাতুল ফেরদৌস স্নিগ্ধা, ম্যাস লাইন মিডিয়া সেন্টার
- অফিসিয়াল সিক্রেসি অ্যাক্ট : অবাধ তথ্য প্রবাহের পক্ষে জনপ্রত্যাশার অন্তরায়  
রোবায়াত ফেরদৌস/মীর মোশারেফ হোসেন, প্রান্তজন-সংখ্যাঃ ২ জুলাই ২০০২
- পথে নামলেই পথ চেনা যাবে: এ জেড এম আবদুল আলী; প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল ২০০৭